XXCE

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

৯৫ বর্ষ ২০০ সংখ্যা শনিবার ২৯ আশ্বিন ১৪২৩ কলকাতা

শিখিলে ভাল

ভারতীয় উপমহাদেশীয় পরিচিতি লইয়া গর্বিত হইবার দিন আজ। গর্বের কারণ— পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম। সরকারি ছড়ির বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভ যে ভাবে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে, গোটা উপমহাদেশে তাহা এক বিরল নৈতিক মেরুদণ্ডের লক্ষণ। আক্ষরিক অর্থে ইহা জেহাদ, কেননা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হইয়াছে, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য পরিবেশনই সংবাদমাধ্যমের একমাত্র ধর্ম, তাহার আর কোনও ধর্ম নাই। বিশেষ করিয়া, সরকারি তর্জন অনুযায়ী পুতুলনাচ কোনও মতেই তাহার কাজ-হইতে পারে না। 'ডন' দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক সিরিল আলমিডা পাকিস্তানের সামরিক মহল ও অসামরিক প্রশাসনিক মহলের মধ্যে মতবিভাজনের সংবাদ পরিবেশন করায় সে দেশের নির্বাচিত সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা লইয়াছে: সেই প্রেক্ষিতেই পত্রিকার এই সম্পাদকীয় প্রতিবাদ। প্রতিবাদ-বার্তাটির মাত্রাবোধ লক্ষণীয়। কোনও অতিরিক্ত ক্রোধ বা ক্ষোভের বাড়াবাড়ি ছাড়াই এক প্রবল আত্মপ্রত্যয় ও সাহসিকতার সহিত সম্পাদকীয় অবস্থানটি ঘোষিত হইয়াছে। গণতান্ত্রিক দেশে গণনির্বাচিত সরকার যে কখনওই গণমাধ্যমের নিরপেক্ষ তথ্যপ্রচারের দায়িত্ব পদদলিত করিতে পারে না, দার্ঢ্য ও সংযমের সহিত সে কথা মনে করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাকে নিছক 'ডন'-এর আত্মপক্ষ সমর্থনের কৌশল ভাবিবার কারণ নাই। সে দেশের অন্য প্রধান সংবাদপত্র 'দ্য নেশন'-ও তাহাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভে একই কথা বলিয়াছে। এই ঘটনায় গোটা উপমহাদেশের সংবাদমাধ্যম জগতের মান বাড়িয়া গেল। রাজনৈতিক প্রভাবে দশদিশাদুষ্ট বলয় হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে সংবাদমাধ্যম কী ভাবে ও কতখানি সক্রিয় থাকিতে পারে, সেই আশ্বাস যেন বিস্মৃতির অনন্ত অতল হইতে উঠিয়া আসিল।

বিশেষ করিয়া সাম্প্রতিক ভারতে বসিয়া এমন আশ্বাস প্রায় অবিশ্বাস্য ঠেকিবার জোগাড়। সাম্প্রতিক অতীতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের একটি অংশ যে ভঙ্গিতে নতমস্তকে শাসকের শাসন-দলন স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহাতে সংবাদমাধ্যমের নৈতিকতা লইয়া প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। তাহাদের একাংশকে দেখিয়া কাহারও সংশয় হইতে পারে, শাসকের প্রতি আনুগত্যকে গোপন করিবার চক্ষুলজ্জাটুকুও বুঝি আর অবশিষ্ট রাখিবার প্রয়োজন নাই। যাহারা নিজেদের রং চিনাইয়া দিতে এতখানি উদ্‌গ্রীব নহে, দুর্জনে বলিবে, তাহারাও নিজেদের হাঁড়ি বাঁধিবার জন্য খেজুর গাছ চিনিতে ভুল করে নাই। যে উগ্র জাতীয়তাবাদী হুঙ্কারে এখন ভারতীয় রাজনীতি টালমাটাল, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই হুঙ্কারে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের একাংশের স্বর প্রবল ও সুস্পষ্ট। এই সংবাদমাধ্যমকে দেখিলে সঞ্জয় গাঁধীও বুঝি লজ্জা পাইতেন।

পাকিস্তানের প্রশাসন গণতন্ত্রের ধারক-বাহক নহে। পাকিস্তানের সামরিক প্রতিষ্ঠান এমনই অমিতপরাক্রমী যে

ABP 15th Oct. 2016

কতটা জনপ্রিয় ছিল পাকিস্তান আন্দোলন

মইদুল ইসলাম

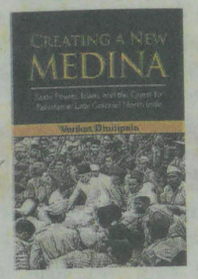

ক্রিয়েটিং আ নিউ মদিনা: স্টেট পাওয়ার, ইসলাম, অ্যান্ড দ্য কোয়েস্ট ফর পাকিস্তান ইন লেট কলোনিয়াল নর্থ ইন্ডিয়া। বেঙ্কট ধুলিপালা। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ৯৯৫.০০

গত কয়েক দশকে পাকিস্তান সৃষ্টির যে ইতিহাস লেখা হয়েছে সেই বিশেষ বিদ্যাক্ষেত্রে আলোচ্য বইটি নতুন সংযোজন। পিএইচ ডি গবেষণাপত্রকে ভিত্তি করে লেখা ৫৩০ পৃষ্ঠার এই বইতে লেখক পাকিস্তান চর্চার ক্ষেত্রে বেশির ভাগ অনুসন্ধানের সঙ্গে হয় দ্বিমত পোষণ করে বা কয়েকটিতে নতুন উপাদান যোগ করার যে চেষ্টা করেছেন, তা অভিনন্দনযোগ্য।

পাকিস্তান গড়ার প্রশ্নে তিনি মূলত তিন ধরনের ঐতিহাসিক মতকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। প্রথমত, ব্রিটিশ সরকার, মুসলিম লিগ নেতৃত্ব ও কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে সাংবিধানিক চুক্তি ও শর্তসাপেক্ষ আলোচনার বিফলতার কারণে পাকিস্তানের জন্ম। দ্বিতীয়ত, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের মতো সাবল্টার্ন ঐতিহাসিকদের মতে পাকিস্তান যদিও একটা আবেগপ্রবণ ধর্মীয় প্রতীক ছিল, তাকে যাঁরা সব থেকে বেশি সমর্থন করেছিলেন তাঁরা আসলে পাকিস্তান সৃষ্টির অর্থ ও তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিলেন। তৃতীয়ত, জিন্না আসলে একটা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তিতে এক ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী পাকিস্তান গড়তে চেয়েছিলেন।

অন্য দিকে, লেখক দেখানর চেষ্টা করেছেন যে পাকিস্তান গড়ার পিছনে মুসলিম লিগ নেতৃত্বের সঙ্গে দেওবন্দি উলেমাদের (পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দে অবস্থিত, ইসলাম ধর্মের পণ্ডিতবর্গ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। লেখকের মতে ১৯৩০-এর দশকের শেষ দিকে মৌলানা আশরাফ আলি থানভি, কংগ্রেস ও কংগ্রেসপন্থী উলেমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুসলিম লিগকে সমর্থন করেছিলেন। অন্য দিকে ১৯৪০-এর দশকের গোড়া থেকেই মৌলানা শাব্বির আহমেদ উসমানি, দেওবন্দি উলেমাদের ভিতরে জিন্নার প্রতি সমর্থন বাড়ানর চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় কংগ্রেসপন্থী উলেমা ও জমিয়ত উলেমা-এ-হিন্দ-এর অগ্রণী নেতা তথা 'সংযুক্ত জাতীয়তাবাদের' প্রবক্তা, মৌলানা হুসেন আহমেদ মাদানির বিরুদ্ধে উসমানির তীব্র অবিশ্বাস ছিল। ১৯৪৫ সালে উসমানি জমিয়ত উলেমা-এ-হিন্দ ছেড়ে জমিয়ত উলেমা-এ-ইসলাম গড়লেন এবং ১৯৪৫ সালের জাতীয় নির্বাচন ও ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লিগের হয়ে দেশব্যাপী প্রচার করেছিলেন। লেখক পাকিস্তানের দাবির পিছনে ১৯৪০-এর দশকের সংযুক্ত প্রদেশের (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) মুসলিম লিগের কর্মী, মুসলিম লিগের নেতৃত্ব, আলিগড়ের মুসলিম আধুনিকতাবাদী, মুসলিম উলেমাদের একাংশ ও জিন্নার ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, পাকিস্তান রাষ্ট্র একটা অস্পষ্ট দাবি ছিল না। বরং প্রথম থেকেই সেই দাবি একটা 'জনপ্রিয়তামূলক কল্পনা ও আগ্রহের' ফল ছিল যা একটি সার্বভৌম ইসলামি রাষ্ট্র তথা এক 'নতুন মদিনা' গড়ার প্রকল্প। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তুর্কি খিলাফতের সমাপ্তির পরে মুসলিম দুনিয়ার রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, তুর্কি খিলাফতের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, মুসলিম দুনিয়ার নেতৃত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল পাকিস্তান জাতিরাষ্ট্রের প্রবক্তাদের মধ্যে। লেখকের ভাষায়, পাকিস্তানের মতো একটা 'জনপ্রিয় ভাবনার' মধ্যে ধর্মবিযুক্ত ও ধর্মীয়, দুই প্রকারের ভাষা ও দাবিই একত্র হয়েছিল।

লেখকের এই মূল বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে কয়েকটা দুর্বলতা চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত পাকিস্তান আন্দোলনকে সব ভারতীয় মুসলিমের এক জনপ্রিয় আন্দোলন বলার জন্য যে রাজনৈতিক তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে 'জনপ্রিয়তা'কে বিশ্লেষণ করার দরকার ছিল তা করা হয়নি। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর ১৯৫১-য় যে আদমসুমারি হয় তাতে ভারতে ৯.৮ শতাংশ বা তিন কোটি চুয়ান্ন লক্ষ মুসলিম নাগরিক ছিলেন। তাই কেন অবিভক্ত ভারতের

মহম্মদ আলি জিন্না (বাঁ দিকে), মৌলানা হুসেন আহমদ মাদানি (ডান দিকে)।

মুসলিম জনগণের এক তাৎপর্যপূর্ণ অংশের মানুষ পাকিস্তান গড়ার ডাকে সাড়া দিলেন না, কেন দেওবন্দি উলেমাদের সংখ্যাগুরু অংশ পাকিস্তানের বিরোধিতা করলেন এবং সর্বোপরি কেন প্রায় সাড়ে তিন কোটি মুসলমান পাকিস্তানের মতো এক 'ইসলামি রাষ্ট্রে' না গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে থাকলেন তার কোনও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এই বইয়ে নেই।

দ্বিতীয়ত পাকিস্তান দাবির পক্ষে বাংলার মুসলিম লিগের ভূমিকা তেমন আলোচনা করা হয়নি। বরং হারুনুর রশিদ ও জয়া চট্টোপাধ্যায়ের দুটি ঐতিহাসিক বইয়ের উল্লেখ করে দায়সারা ভাবে বলা হয়েছে যে বাংলার মুসলিম লিগের নেতারা পূর্ববঙ্গকে হয় স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান অথবা সার্বভৌম সংযুক্ত বঙ্গ করতে চেয়েছিলেন। এখানে লেখকের পক্ষে বলা যেতে পারে যে যেহেতু তিনি উত্তর ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশের মধ্য থেকে পাকিস্তান দাবির সমর্থন খোঁজার চেষ্টা করেছেন তাই বাংলার ইতিহাসকে তিনি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের 'জনপ্রিয়তা' যে প্রথম থেকেই সংকটে ছিল তা পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫০-এর দশক থেকে ভাষা ও শ্রেণিগত দাবি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের মধ্যে দিয়ে আরও পরিস্ফুট হয়। ভারত থেকে পাকিস্তানে যাওয়া উর্দুভাষীদের (যারা মোহাজির নামে খ্যাত) সঙ্গে পাকিস্তান হওয়ার অনতিবিলম্বেই যে বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু হয়— যা এখন নতুন মাত্রা পেয়েছে— তা থেকেই স্পষ্ট, পাকিস্তানের দাবি আসলে তেমন 'জনপ্রিয়' ছিল না।

তৃতীয়ত, লেখকের মতে বিজনোর থেকে প্রকাশিত 'মদিনা' নামক উর্দু পত্রিকা ১৯৪২-'৪৩ নাগাদ পাকিস্তানের দাবিকে পশ্চিমে বম্বে, দক্ষিণে রায়চুর ও পূর্বে চট্টগ্রাম পর্যন্ত জনপ্রিয় করেছিল। তথ্যসমৃদ্ধ প্রামাণিক দলিল ছাড়া, মাত্র কয়েক হাজার ছাপা পত্রিকার কয়েকটা প্রবন্ধের ভিত্তিতে এ হেন দাবি করা যায় কি?

চতুর্থত, উত্তর ভারত থেকে কারা এবং কতজন পশ্চিম পাকিস্তানে গেলেন (কিছু উর্দুভাষী মধ্যবিত্ত চাকুরে ও পেশাজীবী, কিছু ব্যবসায়ী, কিছু জমিদার শ্রেণির লোক যাঁরা অমুসলিমদের ছেড়ে আসা জমি ক্ষতিপূরণ হিসেবে পেয়েছিলেন, অল্প সংখ্যক উলেমা ইত্যাদি) আর কারা গেলেন না (শহরকেন্দ্রিক বিভিন্ন নিপুণ কারিগর যেমন আগ্রার জুতো ও চর্মশিল্প, মোরাদাবাদ, লখনউ ও রামপুরের হস্তশিল্প, আলিগড়ের তালাশিল্প ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত বহু মুসলিম শ্রমিক এবং উত্তর ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামের প্রচুর চাষি যাঁদের জমির সঙ্গে জীবিকা জড়িত) এবং কেন গেলেন না? পাকিস্তান যাওয়া ও না-যাওয়ার পিছনে রাজনীতি বা অর্থনীতির কোনও যোগসূত্র আছে কি না সে ব্যাপারে লেখক নিশ্চুপ। এই ব্যাপারে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার ভিত্তিতে কোনও যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য না থাকলে আজ হিন্দুত্ববাদীরা বলতেই পারেন যে যেহেতু পাকিস্তানের দাবি ভারতীয় মুসলিমদের এক 'জনপ্রিয় দাবি' ছিল তাই তখন যাঁরা পাকিস্তানে যাননি, আজ তাঁরা যেতেই পারেন। হিন্দুত্ববাদীরা মাঝে মধ্যেই অযথা কিছু মানুষকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে পাঠানর কথা বলেন।

পঞ্চমত, উত্তর ভারতে মুসলিম জনতার একাংশের মধ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের বিকল্প রাজনৈতিক দর্শন যথা বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তার যে উদ্ভব ঘটেছিল সেই বিষয়ে লেখক তেমন আলোকপাত করেননি। তিনি প্রগতিশীল লেখক সংঘের উপরে কেবল দুটি গবেষণাপত্রের উল্লেখ করেছেন কিন্তু খিজার হুমায়ুন আনসারির বই, *দ্য ইমার্জেন্স অব সোসালিস্ট থট অ্যামং নর্থ ইন্ডিয়ান মুসলিমস, ১৯১৭-১৯৪৭* বইটা পড়তে পারতেন। অন্য দিকে আলিগড়ের মুসলিম আধুনিকদের কথা বলার জন্য ফয়সাল দেভজির দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা সুখপাঠ্য, *মুসলিম ন্যাশনালিজম: ফাউন্ডিং আইডেন্টিটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া* বইটি পড়তে পারতেন। অনেক জায়গায়, বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, কে এম আশরাফকে উদ্ধৃত করা হলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে ফুটনোটে কোনও উল্লেখ নেই। বহু জায়গায় পাকিস্তান আন্দোলনের সব থেকে বড় চিন্তাবিদ, মুহাম্মদ ইকবালের কথা উল্লেখ করা হলেও তাঁর কোনও লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়নি। ফুটনোট ও গ্রন্থপঞ্জিতে কোনও বইয়ের প্রকাশকের নামের উল্লেখ নেই যা ছাত্র ও গবেষকদের সাহায্য করত। তবে সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র নির্মাণের সম্ভাব্য কারণগুলি নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে গত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন মত রয়েছে সেই বিতর্কে এই নবীন ইতিহাসবিদ নতুন উদ্দীপনা ও উৎসাহের উদ্রেক ঘটিয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পাকিস্তান আন্দোলনকে সব ভারতীয় মুসলিমের এক জনপ্রিয় আন্দোলন বলার জন্য যে বিশ্লেষণ করার দরকার ছিল তা করা হয়নি।